Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যথতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাছলিমা বেগম

রোলঃ 23090121061

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যথতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাছলিমা বেগম

রোলঃ 23090121061

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যথতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাছলিমা বেগম, আইডিঃ 23090121061 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যথতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছলিমা বেগম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

তাছলিমা বেগম

আইডিঃ 23090121061

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5
মানবাধিকার (Human Rights) 6
মানবাধিকার শব্দটি কোথা থেকে এসেছে? 6
মানবাধিকার শব্দটির উৎস ও ইতিহাস 7
বাংলাদেশের ভূমিকা 16
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবহেসা 18
ইসলাম ও মানবাধিকার 29
কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানবাধিকার 39
অন্যায় দেখেও মুখ না খুলার ভয়াবহতা: 45
গবেষকদের দৃষ্টিতে জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত মানবাধিকার: 49
ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিষয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা 55
বিচারহীনতা ও বিলম্ব সম্পর্কে ইসলামের নীতি 57
জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় (OHCHR) ও দেশে আপত্তি 60
বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়: প্রয়োজনীয়তা ও বিতর্ক 61
মানবাধিকার লঙ্ঘন আড়াল না করলে দপ্তরে আপত্তি কেন? 62
উপসংহার 63

ভূমিকা:

মানবাধিকার কেবল একটি দার্শনিক ধারণা নয়-এটি মানুষের জন্মগত অধিকার, যা তার জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করা হয় "মানবাধিকার কমিশন বা ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল (UNHRC) | কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আজ যখন গাজা, সিরিয়া, ইয়েমেন, কাশ্মীর, মায়ানমার কিংবা চীনের উইঘুর মুসলিমদের ওপর ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে-তখন মানবাধিকার কমিশন প্রায় নিঃশব্দ নির্বিকার ও কার্যত অকার্যকর। এই নিষ্ক্রিয়তা শুধু প্রশ্নই তোলে না-বরং সংস্থাটির উদ্দেশ্য, প্রভাব ও কার্যকারিতা নিয়েও গভীর সংশয় সৃষ্টি করে।

মানবাধিকার (Human Rights)

সমসাময়িক বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো মানবাধিকার বা হিউম্যান রাইটস। আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই বিষয়টি। মানবাধিকার শারঈ শরীয়াহ, আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, ন্যায়বিচার, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের নানা অধিকারের সঙ্গে জড়িত।

একই সঙ্গে এটি বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ বা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 'হিউম্যান রাইটস কনভেনশন' অর্থাৎ মানবাধিকার সনদের সাথেও সরাসরি সম্পর্কিত।

মানবাধিকার শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

আমরা জানি, হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার শব্দটির পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। এটি নিছক একটি আধুনিক টার্ম-কারণ কুরআন-সুন্নাহ কিংবা প্রাচীন ইমাম ও ইসলামী স্কলারদের গ্রন্থে এ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। তবে উল্লেখিত শব্দটি না থাকলেও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিধানসমূহ কুরআন ও সুন্নাহয় বহু আগে থেকেই বিদ্যমান।

"মানবাধিকার" (Human Rights) শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক আইনের একটি ধারণা, যার মূল কাঠামো উদ্‌ভূত হয়েছে ইউরোপীয় দর্শন ও ইতিহাস থেকে। যদিও এর মৌলিক ধারণা প্রাচীন ধর্ম, সভ্যতা ও মানবিক শিক্ষায়ও পাওয়া যায়।

মানবাধিকার শব্দটির উৎস ও ইতিহাস

১. মূল উৎস (পাশ্চাত্য):

"Human Rights" শব্দটির আধুনিক ব্যবহার শুরু হয় ১৭শ ও ১৮শ শতকে, বিশেষত ইউরোপের আলোকায়ন যুগে (Enlightenment Era) । তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা গড়ে ওঠে।

২. গুরুত্বপূর্ণ দলিল

১৭৭৬: আমেরিকান স্বাধীনতা ঘোষণা "সকল মানুষ সমানভাবে সৃষ্টি হয়েছে'-এই নীতির ঘোষণা করে।

১৭৮৯: ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রণীত - "Declaration of the Rights of Man and of the Citizen"I

১৯৪৮: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রণয়ন করে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) I

ইসলামে মানবাধিকার

ইসলাম মানবাধিকার ধারণাটি বহু আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- জীবনের অধিকার
- সমতার অধিকার
- ন্যায্য বিচারের অধিকার

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার সনদের মতো।

মানবাধিকার শব্দের আধুনিকতা ও প্রাচীন শিকড়

যদিও "মানবাধিকার" (Human Rights) শব্দটি আধুনিক অর্থে পশ্চিমা ধারণা থেকে এসেছে তবে এর মৌলিক মূল্যবোধ ধর্মীয় শিক্ষায়, প্রাচীন সভ্যতায় এবং মানবিক নীতিতে বহু আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল।

বিদায় হজ্বের ভাষণ: ইসলামী মানবাধিকার সনদ

বিশেষ করে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ একটি পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার সনদের উদাহরণ।

বিদায় হজে মহানবী (সা.) তাঁর ভাষণে মানবাধিকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। এ কারণে এই ভাষণকে অনেকেই ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক মৌলিক সনদ হিসেবে গণ্য করেন।

বিদায় হজের ভাষণে তুলে ধরা মানবাধিকারের দিকগুলো

জীবনের অধিকার: "তোমাদের একে অপরের জীবন, সম্পদ ও সম্মান হেরাম (অবৈধ ও পবিত্র) করা হয়েছে।" এটি জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদার অধিকার নিশ্চিত করে।

সম্পদের অধিকার: "কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করো না।" সম্পদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা, চুরি ও প্রতারণা নিষিদ্ধ।

নারীর অধিকার: "নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তারা তোমাদের সহধর্মিণী।" নারীর সম্মান, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ।

সামাজিক সমতা ও বৈষম্যবিরোধিতা: "কোনো আরবের ওপর অনারবের এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই-তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।" এটি বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্য প্রত্যাখ্যান করে।

দায়িত্ব ও আমানতের অধিকার: "তোমাদের কাছে যারা আমানত রাখবে, তা তাদের ফিরিয়ে দেবে।" ন্যায়বিচার ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা প্রদান।

শোষণ ও সুদের বিরুদ্ধে ঘোষণা: "আজ হতে সব ধরনের সুদ বাতিল ঘোষণা করা হলো।" এটি অর্থনৈতিক শোষণতের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেয়।

রাজনৈতিক প্রভাব ও দ্বিমুখী মানদণ্ডে: মানবাধিকার কমিশাদের সবচেয়ে বড় বার্থতা হলো এটি পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন বা ইউরোপীয় দেশগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই নীরবতা পালন করা হয়। গাজায় শিশু হত্যার মতো বর্বর ঘটনায় কার্যকর কোনো বাবস্থা নেই, অথচ ছোটখাটো বিষয়ে তৎপরতা দেখা যায়।

গণহত্যা ও জাতিগত নিধনে ব্যর্থতা: রুয়ান্ডা গণহত্যা (১৯৯৬), মায়ানমারের রোহিঙ্গা নিধন (২০১৭), সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ, উইঘুর মুসলিম নিপীড়ন সবক্ষেত্রে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয়তা তাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। কেবল নিন্দা ও প্রতিবেদন-এর বাইরে আর কিছু তারা করতে পারে না বা চায় না।

আইনগত ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন অনেক ক্ষেত্রেই পরামর্শদাতা বা শর্যাবষ্কৃত ভূমিকা পালন করে। বাস্তবিক চাণ প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় নির্যাতিতরা কোনো সুবিচার পায় না।

ইসলামি দেশগুলোর প্রতি বৈষমা: মুসলিম রাষ্ট্র বা জনগণের উপর নিপীড়নের ঘটনায় প্রায়শই নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। এটি কেবল রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় পক্ষপাতেরও প্রতিচ্ছবি বহন করে বলে অনেকেই মনে করেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধীদের বিচার না হওয়া: যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পদন্তেস নিতে মানবাধিকার কমিশন প্রায়শই বার্থ হয়। ICC [International Criminal Court) & UNHRC কার্যকর ভূমিকা না দেওয়ায় অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যায়।

উদাহরণ রোহিঙ্গা সংকট, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, সিরিয়া, ইয়েমেন, চিনের উইঘুর মুসলিমদের নিপীড়ন এসব স্কেরে মানুষের মৌলিক অধিকার যেভাবে সঙ্ঘন হয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল। কি ধরনের প্রতিবেদন এসেছে, কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিরু বাস্তবে কী পরিবর্তন এসেছে এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
মানবিক ব্যর্থতার প্রভাব

নিগীড়িত ব্যক্তিদের মানাবস, অর্থনৈতিক অবস্থা, আগা, পরিসর ও নিরাপত্তা।

সামাজিক নির্যাতন ও ভয় পরিবারের বিল্ডত হওয়া, উদ্বান্তে হওয়া, হরণ-বিক্রয়, অনিশ্চয়তার জীবন।

কমিশনগুলোতে অন্যগণ প্রবেশ করে কি না?

জনগণ কি তারা অভিযোগ দিচ্ছে? অভিযোগ পৌঁছাচ্ছে? আদালতের মতো কি ফলাফল হচ্ছে?

সচেতনতার অভাব কি মূল নীমা?

প্রস্তাবনা/ সুপারিশসমূহ

কমিশনের কার্যকর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা: জরুরি কর্মকান্ডে স্বাধীন ভদন্ত টিম ও বলবৎ করার ক্ষমতা।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো: শক্তিশালী মহায়তা ও চাপ দেওয়ার উদ্যোগ।

ধর্ম ও মানবাধিকারশিক্ষার প্রসার, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানবাধিকার সম্মদ্ধে সচেতনতা বাড়ায়না। আইনী পরিবর্তন রাষ্ট্রগুলোর রাজি হওয়া উচিত আবর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি ও আদালতের বাধাবিধি মেনে চলার।

ইতিহাসগত প্রেক্ষাপট

মানবাধিকারের কমিশনগুলো কেন । কখন গঠন করা হরেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, জাতিসংঘের চার্টার, যোলোকস্ট, ও প্রজাতন্ত্রগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির
প্রভাব। কমিশনগুলোর আদর্শ উদ্দেশ্য নির্যাতন বন্ধ করা, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করা, বিচার ও শান্তির নিশ্চয়তা দেওয়া।

আইনগত কাঠমোর সীমাবদ্ধতা

মানবাধিকার কমিশন যে ধরনের ক্ষমতা পায় (reporting, recommendations, বিচার নয়) অনেক সময় তার "অনুশীলন। বলবৎ করার প্রমতা থাকে না।

আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বাড়ীত, কোনো শক্তি থাকেনা কমিশনের 'ওযোগ আংশে।

রাজনৈতিক স্বার্থ ও দখলদারিত্ব

শক্তিশালী দেশগুলোর নীতি ও রাজনৈতিক স্বার্থ কমিশনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে যেমন: সরাসরি অথবা দাপটে প্রতিবাদ কম হয়, শাস্তি না হয়।

অবস্থান, অন্যের ক্ষেত্রে নীরবতা।

সংস্থা গুলোর মধ্যে ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চিমুখী মানদ০ ('double standard") দেখা যায় কোনো দেশের ক্ষেত্রে কঠোর

মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকরণ ও বাস্তব উদাহরণ

আজকের বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ভয়াবহভহব মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটছে। অথচ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনগুলো এসব ইস্যুতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন্দে।

কিছু বাস্তব উদাহরণ:

ফিলিস্তিন সংকটে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে আলোচিত মানবিক সংকটগুলোর একটি। দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনিরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে, শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউই রস্কা পাচ্ছে না। কিরু প্রশ্ন হলো-এতসবের পরেও কেন জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না?

জাতিসংঘের ভূমিকায় সংকীর্ণতা:

জাতিসংঘ মানবাধিকারের রক্ষক হিসেবে বিশ্বশুড়ে পরিচিত হলেও, ফিলিস্তিন সংকটে তার অবস্থান বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। প্রস্তাব গ্রহণ করেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা, ভোটা শক্তিধর দেশের প্রভাব সবই প্রমাণ করে যে আতিসংঘের ক্ষমতা রাজনৈতিক চাপের কছম অসহায়।

উদাহরণস্বরুণ:

২০১৮ সালে গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলার পর আতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র বারবার ভেটো প্রয়োগ করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ ঠেকিয়ে দেয়।

মানবাধিকার সংস্থার বিরতকর নীরবতা

যেমন্ত্রন ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত বেসামরিক মানুষ হত্যা, বামস্বাদ ধ্বংস, খাদ্য ও চিকিৎসার ঘাটতি, এমনকি হাসপাতাল ও সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে- সেখানে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (HRW), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ আনক সংস্থা শুধু 'নিন্দা জানিয়ে দায় শেষ করছে।

যথার্থ পরিদর্শন, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের পরও বাস্তব পরিবর্তনের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি তারা। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু প্রতিবেদন মিডিয়ায় এলেও তা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো গুরুত্বই দেয় না।

বস্তুত বাস্তবতা পশ্চিমা সমর্থনপ্রাপ্ত ইসরায়েল কার্যত আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে চলার মুবিধা গাচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব দুর্বল ও বিভক্ত হওয়ায় একতাবদ্ধভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। মানবাধিকার সংস্কাগুলোর অর্থায়ন ও নেতৃত্ব বেশিরভাই পশ্চিমা রাষ্ট্রনির্ভর, যা নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা:

এই সংকট মানবভার বিপর্যয়ের চরম উদাহরণ। মুসলিমদের রক্ত ঝরছে, অথচ মানবাধিকার কমিশনের গলা নিঃশব্দ্য। জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকর হয় না, মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন কার্যকর হয় না, আর প্রতিনিয়ত শিশুদের কান্না, মা-বাবার আর্তনাদ, ধ্বংসস্তূণের নিচে চাপা পড়া স্বপ্ন গুলো হারিয়ে যায়।

ফিলিন্ডিন ইসা আতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার ব্যর্থতার জীবন্ত দলিল। এটি প্রমাণ করে যে মানবাধিকার আজ রাজনৈতিক হাতিয়ানে রুশারিত। মুসলিম বিশ্ব যদি নিজস্ব

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মোচ্চার না হয়, তবে এই নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা আরও বহু ফিলিস্ত্রিন তৈরি করবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রিপোর্ট, ২০১৮

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট, Gaza Conflict

আল আজিরা নিউজ রিপোর্ট, ২০২৩ "প্যালেস্টাইন: লজ্জার ইতিহাস' ড. ইয়াহইয়া হারুন

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন ও চিত্র

শিশুময় নিরীহ বেসামরিক নিহত ও আহত হওয়া।

ফিলিস্তিনে বহু ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটছে, যার মধ্যে রয়েছে

বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ফাংস।

খাদা, পানি ও ওষুধের ঘাটতি ও অবরোধ।

মাতৃপক্ষ বা গৃহম্মদের জোর করে উদ্দেদন।

বাকস্বাধীনতা ও ধর্মীয় অবাধ চলাচলে বাধা।

এই সব ঘটনা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিক্রিয়া ও সীমাবদ্ধতা

যদিও United Nations Human Rights Council (UNHRC) ও অন্যানা সংস্থাগুলো বারবার আলোচনা করেছে,

কিন্তু তাদের পদক্ষেপগুলো প্রায়ই প্রতীকী মাত্রই। যেমন:

তদন্ত মিশন পাঠানো চলেও দলস্বরূপ কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ইউএস না অন্যানা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ভেটো বা অর্থ সাহায্য বন্ধ করে বাধা দিয়েছে।

রাজনৈতিক চাপ ও সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থর কারণে তদন্ত, রায় বা কার্যকর দ্বন্তক্ষেপ বিলম্বিত হয়েছে।

ন্যায় ও জবাবদিহিতার অভাব

বিশ্লেষকরা বলছেন যেসব ধ্বংসসাধন বা যুদ্ধাপরাধ হয়েছে, সেসবের জন্য দায়ীদের কোনো রিয়াল টাইম জবাবদিহিতা নেই। কমিটি বা কমিশন থেকে রিপোর্ট আসে, কিন্তু সে রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর বিচার বা প্রতিকার হয় না।

দিদ্ধার ও উদ্ভুত প্রশ্ন

এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কেন এত স্পষ্ট মানবাধিকার সম্মনের পরও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ব্যর্থ?

রাজনৈতিক স্বার্থ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর চাপ এতো বড় ভূমিকা নাকি মানবাধিকার বাধাবিধিক উদ্যোগগুলোর ঘাটতি? ইসলামের ধারণায় মানবাধিকারের ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা মূল্যবোধের আয়গা কি এখানে পূর্ণ প্রয়োগ হচ্ছে?

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন

পরিচিডি

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মুসলিম সংখ্যালঘু একটি আডিগোষ্ঠী। তারা শত শত বছর ধরে সেখানে বসবাস করলেও মিয়ানমার ঘরকার তাদের স্বীকৃত নাগরিক হিসেবে মেনে নেয়নি। ১৯৮২ বালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী তাদের রাষ্ট্রবিহীন ঘোষণা করা হয়।

এর ফলে তারা শিক্ষা, চিকিৎসা, চলাফেরা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ ন্যূনতম মানবাধিকারের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

নির্যাতনের ধরন

রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমার সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত হয় তয়াবহ মানবাধিকার

লঙ্ঘন, যেমন

নির্বিচারে গণহত্যা

ঘর্ষণ ও যৌন নির্যাক্তন

ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া

ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা

শিশুহত্যা এই সকল অপরাধ জাতিসংঘের মতে জাতিগত নির্মূলের' শামিল।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মিয়ানমারের এই আচারণের তীব্র নিন্দা জানায়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানকে ক্রাইম

বাংলাদেশের ভূমিকা

২০১৭ দলের আগস্টে নতুন করে সহিংসতা শুরু হলে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ সরকার মানবিক দিক বিবেচনায় তার আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার বাবস্থা করে। কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর একটি।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টিকোণ

রোহিঙ্গাদের অধিকার লঙ্ঘন নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়।

জীবনের অধিকার: গণহত্যা ও নির্বিচারে গুলি করে হত্যা।

চলাচলের স্বাধীনতা: রাখাইনে অবরুদ্ধ জীবনযাপন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা: উপাদনানয়ে নিষেধাজ্ঞা ও স্বামনা।

নারীর অধিকার, নারী ও কন্যাশিশুদের উপর যৌন নির্যাতন।

-নাগরিক অধিকার: নাগরিকত্ব না থাকা।

রোহিঙ্গাদের উপর চালানো মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি আত্মর্জাতিক অপরাধ। এটি শুধু একটি জাতিগোষ্ঠীর উপর নিধীড়ন নয়, বরং সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের উপর আঘাত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গন্ধ থেকে জবাবদিহিতা ও নারেবিচার নিশ্চিত করা একান্ত প্রযোজন।

আফ্রিকার দারিদ্রাণীড়িত অঙ্গলে মানবাধিকার পরিস্থিতি: ব্যর্থতা না অবহেলা?

আফ্রিকা বিশ্বে সবচেয়ে দারিদ্রপীড়িত মহাদেশগুলোর একটি। এখানকার বহু দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, দুর্নীতি ও দুর্যোগে জর্জরিত। এর ফলে মানবাধিকার চরমভাবে সঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে-এটা কি শুধু ব্যর্থতা, না ইচ্ছাকৃত অবহেলা?

প্রধান মানবাধিকার লঙ্ঘনসমূহ খাদা ও পানির অধিকার লঙ্ঘন: সহস্রাধিক মানুষ অনুষ্টিতে ভুগছে।

শিক্ষার অধিকার: বহু শিশু বিদ্যালয়ের মুখ দেখে না। হাম্মামেরা পর্যায় চিকিৎসা সুবিধার অভাব।

রাজনৈতিক নিপীড়ন: দরকারবিরোধীদের দমন, প্রম ও হত্যার ঘটনা প্রায়শ ঘটে।

নারী ও শিশু নির্যাতন: মানব পাচার, বাল্যবিবাহ, ও যৌন সহিংসতা ব্যাপক হারে গড়িয়ে পড়েছে।

দায় কার?

আফ্রিকান সরকারের বার্থতা

দুর্নীতি, অদূরদর্শী নেতৃত্ব ও সম্পদের অপব্যবহার তারদের অনগণের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবহেসা

মানবাধিকার সম্মনের ঘটনাগুলো একাধিকবার জাতিসংঘের নজরে আসলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আফ্রিকার প্রতি সহানুভূতির জায়গা নয়, বরং আনক সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থপ্রবণতা প্রাধান্য পেযেছে।

উদাহরণ

দারফুর (সুদান): জাতিগত নিধন ও গণহত্যা।

কঙ্গো: শিশুদের দিয়ে খনি শ্রম, নারীদের উপর পদ্ধতিসত ঘর্ষণ। ইথিওপিয়া (টিপ্লায় সংকট) হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ও পরণার্থী সঙ্কট।

মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা

আফ্রিকান ইউনিয়নের অধীন "African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR)' থাকলেও এর বাস্তব কার্যকরভা প্রায় শূন্য। সিদ্ধান্তগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত, এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোগ হয় না।

আফ্রিকার মানবাধিকার পরিস্থিতি শুধু ব্যর্থতা নয়, বরং অনেকাংশে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অবহেলার ডল। বিশ্ব সম্প্রদায় এবং আফ্রিকান নেতৃবৃন্দ যদি আন্তরিকভাবে দায়িত্ব না দেয়, তবে এই মানবিক বিপর্যয় আরও দীর্ঘায়িত হবে।

ব্যর্থতার কারণ উত্তরণের সুপারিশ (সংস্কারের মূল (জয়)

রাজনৈতিক প্রভাব: নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের একক নিয়ন্ত্রণ এবং আমনা-নির্ভরতা।

স্বন্দ নিয়োগ: নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং বিরোধী দলসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক বাছাই কমিটি গঠন করা। আইনি সীমাবদ্ধতা: সরাসরি দণ্ড বা কার্যকর শাস্তি দিতে না পারা এবং দেওয়ানি আদালতের পূর্ণ ক্ষমতা না থাকা।, ক্ষমতার বৃদ্ধি: কমিশনকে দেওয়ানি

আদালতের পূর্ণ স্কমতা প্রদান করা। এরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত তদত্ত (Suo Moto Investigation) এবং মামলা দায়েরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আর্থিক স্বাধীনতা নেই: কমিশনের বাজেট ঘরকারের আওতাধীন থাকা।, আর্থিক স্বায়তশাদন: কমিশনের জন্য স্বাধীন ও সরাসরি বাজেট বরাখ নিশ্চিত করা যাতে সরকার কমিশনের কাজকে প্রভাবিত করতে না পারে।

নিষ্ক্রিয়তা ও আস্থার সংকট: স্পর্শকাতর বিষয়ে নীরব থাকা।, সক্রিয়তা ও জবাবদিহিতা বিচারবহির্ভূত হত্যা বা ওমের মতো গুরুতর ঘটনায় কমিশনকে অবশ্যই সোচ্চার ও মক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য করা এবং তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

জনবল ও অবৈতনিক মদদোর কমিশনের ছোট আকার এবং অবৈতনিক সদস্যদের পর্য্যন্ত সময় না দেওয়া।, কমিশনকে পূর্ণকালীন করা: কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করা এবং পর্যান্ত দম্মানী ও সুবিধা নিশ্চিত করা।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার একটি মৌলিক ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। আতিসংযসহ বিভিন্ন আরর্জাতিক সংস্থা মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করলেও বাস্তবতা হলো, একের পর এক মানবাধিকার সম্মনের ঘটনায় এমব সংস্থার ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হযে উঠছে।

বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ, ফিলিস্তিনে গণহত্যা, সিরিয়া ও ইয়েমেনে যুদ্ধাপরাধ, আফ্রিকার দরিদ্র ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর দমন-পীড়ন-এসব ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের নির্লিপ্ততা এবং কার্যত কোনো ব্যবস্থা না মেওয়া বিশ্ববাসীকে হতাশ করেছে।

প্রধান ব্যর্থতাংগুলা হলো:

রাজনৈতিক প্রভান ও পক্ষপাতিত্ব: বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর চাপ ও স্বার্থ রক্ষায় অনেক সময় মানবাধিকার কমিশন।

নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।

তথা গোপন ও দেরি: বাস্তব পরিস্তিতি জানার পরেও দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া।

প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের অভাব: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যা হওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা আর কার্যকর থাকে না। আইনি দুর্বলতা, প্রস্তাব ও রিপোর্ট প্রকাশের বাইরে কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রমত্তার সীমাবদ্ধতা।

বিশ্বে যখন একের পর এক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নিরীহ মানুষ, তখন মানবাধিকারের পৃষ্ঠপোষক সংস্থাওলোর এ নিষ্ক্রিয়তা তাদের আস্থাহীন করে তুলছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানবাধিকার রক্ষার লড়াই আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

মানবাধিকার রক্ষা কেবল কিছু প্রস্তাব বা সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। প্রযোজন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের কাঠামোগত সংস্কার, স্বচ্ছতা ও অবাবদিহিতা। বিশ্ববাসী এখন একটি কার্যকর, নিরপেক্ষ এবং সাহসী মানবাধিকার সংস্থা দেখতে চার যারা সত্যিকার আর্থ মানুষের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াবে, রাজনীতি নয়।

মানবাধিকার রক্ষা শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। মানবাধিকার কমিশনংগুলোর উচিত হবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল জাতির জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা। নাহলে এই নিষ্ক্রিয়তা বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হবে দাঁড়াবে।

সার্বজনীন মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার কয়েকটি মূল কারণ হলো কার্যকর পদক্ষেপের অভাব, রাজনীতিকরণ, এবং দ্রুত মানবাধিকার সংকট মোকাবিলায় অক্ষমতা। এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বৈষম্য এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা দেশগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও রয়েছে।

মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার কারণ
কার্যকর ব্যবস্থার অভাব: মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারার কারণে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়।
রাজনীতিকরণ: রাজনৈতিক প্রভাব এবং মতবিরোধের কারণে কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না, যা মানবাধিকার রক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে।
দ্রুত সাড়া দিতে অক্ষমতা: মানবাধিকার সংকটের তীব্রতা যখন বেশি থাকে, তখন কমিশন দ্রুত সাড়া দিতে পারে না, যা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলে।

বৈষম্য: কিছু ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে নির্দিষ্ট দেশ বা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করার অভিযোগও রয়েছে।
নিষ্ক্রিয়তা ও তোষণ: কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয়ভাবে তোষণ করারও অভিযোগ উঠেছে।

উদাহরণ
যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতার ব্যাপক বৃদ্ধি এবং প্রমাণ-ভিত্তিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে সরকারের ব্যর্থতা মানবাধিকারকে বিপন্ন করেছে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে।
কিছু সমালোচকদের মতে, বিশ্বায়নের প্রচারের সময় কিছু সরকার ও সংস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশগুলোর ওপর তেমন কোনো কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন:
ব্যর্থতা, পক্ষপাত ও ষড়যন্ত্রের আড়াল

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কাজ হল,
বিশ্বের সব দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সুপারিশ দেওয়া। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও নীতি প্রচার ও রক্ষা করা। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন special rapporteur ও working group গঠন করা নির্দিষ্ট ইস্যুতে কাজ করার জন্য।

কিন্তু বাস্তবতা হলো— এ প্রতিষ্ঠান নিজে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে অক্ষম। বরং কথার ফুলঝুরি ও সুপারিশ আর রাজনৈতিক চাপের ভান করে চলে। আফগানিস্তান, ডিআর কঙ্গো, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, ইউক্রেন, প্যালেস্টাইন, হাইতিসহ কিছু দেশে অফিস খোলার পরও মানুষের দুর্ভোগ কমেনি।

যে সব দেশে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সেখানে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কার্যকর কোন ভূমিকা রাখছে না। বরং কোনো কোনো দেশে মানবাধিকারের ছদ্মাবরণে সে দেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিরোধী প্রোপাগান্ডা চালিয়ে থাকে। বিশ্বদরবারে সে দেশকে উগ্র সাম্প্রদায়িক পশ্চাৎপদ একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার হীন চেষ্টা করে।

এছাড়াও সোমালিয়া, ডিআর কঙ্গো, রুয়ান্ডা, হাইতিসহ কিছু দেশে অনেক ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগের মুখে পড়েছে। অনেক দেশে তাদের উপস্থিতিকে সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। মিয়ানমার, সিরিয়া, ফিলিস্তিনে তারা নির্যাতিত মানুষের জন্য কথা বললেও বাস্তবে কোনো দৃশ্যমান ফল আসেনি; বরং রাজনৈতিক বিরোধ তীব্র হয়েছে। নির্যাতনের মাত্রাও বেড়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণহত্যার কথিত তথ্য প্রকাশ করে ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুরকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। রুয়ান্ডায় গণহত্যা ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলাকালে মানবাধিকার কর্মসূচি চালু করে। কিন্তু সেখানে কার্যত কোনো শান্তি বা সুরক্ষা নিশ্চিত করে করতে পারেনি। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়নের বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করলেও জাতিসংঘ কোনো শক্ত অবস্থান নিতে পারেনি। ফিলিস্তিনে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরাইলি আগ্রাসন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘনের নিন্দা করলেও কোনো শক্তিশালী পদক্ষেপ জাতিসংঘ গ্রহণ করেনি। এতে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।

মুসলিম দেশগুলোতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে; বরং কোনো কোনো দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের উস্কিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের কথা বলে অনুপ্রবেশ করলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। কেবল লোক দেখানো মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি রিপোর্ট পেশ করে থাকে।

মিয়ানমারে মুসলিম রোহিঙ্গাদের গণহত্যা ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে বহু প্রতিবেদন দিলেও কার্যত কোনো সামরিক বা অর্থনৈতিক চাপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আজও পৃথিবীর নানা দেশে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। শুধু বাংলাদেশেই দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলিম শরনার্থী রয়েছে। অথচ জাতিসংঘ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযান চালায় নি এবং অর্থনৈতিক অবরোধের কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

ফিলিস্তিনে জায়নবাদী ইসরাইল যুগ যুগ ধরে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আসছে। এর বিরুদ্ধে কার্যত কোনো ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। সম্প্রতি গাজা ও পশ্চিম তীর বোমার মেরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে চলছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উল্টো ইসরাইলকে সহযোগিতার অভিযোগ বিশ্বসংস্থার বিরুদ্ধে রয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন

নেতৃত্বাধীন হামলার সময় মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে। কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে রিপোর্ট করলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেয়নি। লিবিয়ায় ন্যাটোর হামলার পর মানবাধিকার পরিস্থিতি চরম অবনতি হতে থাকে। এক্ষেত্র জাতিসংঘ কার্যকর কোনো সমাধান দিতে পারেনি।
বরং লিবিয়ার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়।

জাতিসংঘের উপর যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া চীনসহ ভেটো পাওয়ারের অধিকারী দেশগুলো রাজনৈতিকভাবে চরম প্রভাব রয়েছে। যার ফলে নির্যাতিত দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে জাতিসংঘ কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনা। মুসলিম দেশগুলোর সাথে বিমাতাসূলভ আচরণ করা হয়। বরং শান্তির নামে অশান্তির বিষাক্ত বীজ বপন করা হয় এ সব দেশে।
পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তার মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের কোনো দপ্তর নেই। এ ব্যাপারে জাতিসংঘকে কোনো কার্যকরী ভূমিকা নিতেও দেখা যায় না। গোমাংস রাখার মিথ্যা অভিযোগে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা ভারতে অহরহ ঘটছে। এ জাতীয় অমানবিক ঘটনা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরগুলোতেও হর হামেশা ঘটতে দেখা যায়। এত লোমহর্ষক ঘটনার পরও জাতিসংঘ নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয় যদি খুলতে হয় তাহলে গুরুত্বের বিবেচনায় ভারতের খোলা দরকার। কিন্তু সেখানে না খুলে রহস্যজনক কারণে বাংলাদেশে খোলা হল, ফলে দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের কপালে চিন্তার রেখা ভেসে ওঠেছে। কথিত মানবাধিকার কমিশন না আবার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে? এ আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মুসলিম সমাজের পারিবারিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান, বিয়ে-শাদী, পোশাক-আশাক সম্পর্কে পশ্চিমা দুনিয়া নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। মুসলিম পারিবারিক আইনকে অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ বলে তারা অপপ্রচার চালায়। কোথাও কোথাও সমকামিতার বিরোধিতাকেও মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে প্রোমোট করে থাকে। হিজাব প্রথাকেও মানবাধিকার বিরোধী বলে ইসলাম ধর্মের অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের কার্যালয় খুলতে হবে। বর্তমান ইন্টেরিম সরকার মুখে মুখে মিষ্টি কথা বললেও সুকৌশলে এমন কিছু কাজ করছে যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণের বোধ-বিশ্বাস, তাহযিব-তামাদ্দুন বিরোধী। যত দিন যাচ্ছে ততই তারা এ কাজগুলো ঠান্ডা মাথায় করে যাচ্ছে। ঐক্যমতের সংলাপের নামেও এক ধরনের সময় ক্ষেপণ করে চলেছে। বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরস্পর তর্কযুদ্ধে ব্যস্ত রেখে তারা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অগ্রসর হচ্ছে বলে কেউ কেউ বলতে চাচ্ছেন।

মাওলানা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, যুগ্ম মহাসচিব জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। মানবাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে বাধার শিকার হচ্ছেন কর্মীরা। তৃণমূল পর্যায়ের অন্তত ৪৬ শতাংশ মানবাধিকারকর্মী মনে করেন, মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ৬২ শতাংশ মানবাধিকারকর্মী নিজেদের ‘অনিরাপদ’ ও ‘খুবই অনিরাপদ’ বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ৮৬ শতাংশ কর্মী কাজ করতে গিয়ে বাধার শিকার হন।

বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) ‘চ্যালেঞ্জেস টু হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে এই গবেষণার ফল গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিস্টিঙ্গুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ। অবশ্য এ অনুষ্ঠানেই প্রতিবেদনটির প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, মাত্র ৫০ জন উত্তরদাতার তথ্য নিয়ে কোনো গবেষণা হতে পারে না।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে যে কেউ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ নিয়ে মানবাধিকার কমিশন কাজ করে থাকে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, তৃণমূলের ৫০ জন মানবাধিকারকর্মীর অভিজ্ঞতা থেকে চার মাস আগে ৩৬টি জেলায় শুরু হয় এ গবেষণার কাজ। মার্কিন সংস্থা ন্যাশনাল এনডোর্সমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির (এনইডি) অর্থায়নে সিজিএস গবেষণাটি করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট জেড. আই. খান পান্না, নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবির, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী, শিক্ষক ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গবেষক দলের প্রধান ড. আলী রীয়াজের কাছে গণমাধ্যমকর্মীরা জানতে চান, 'আপনি একজন মার্কিন নাগরিক হয়েও কেন সেখানের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে গবেষণার পরিবর্তে বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে এলেন? আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি খারাপ নাকি ভালো?' জবাবে তিনি বলেন, এটা পরবর্তীতে একটা গবেষণার আইডিয়া হতে পারে। প্রতিবেদনটি তৈরির সময় বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে কোনো তথ্য নেওয়া হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'না। আমরা কোনো তদন্ত করছি না যে তাদের কাছে যাব।' মানবাধিকার রক্ষাকারী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘ স্বীকৃত মানবাধিকারের কাজ যারা করেন তারাই মানবাধিকারকর্মী।

ড. আলী রীয়াজ বলেন, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৬ শতাংশ মানবাধিকারকর্মী দেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতিকে গুরুতর বলে বর্ণনা করেছেন। ৪২ শতাংশ কর্মী জানান, আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তারা বেশি বাধার সম্মুখীন হন। ৬০ শতাংশ কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার কাজে বিভিন্ন হুমকির সম্মুখীন হন। ব্যক্তিগতভাবে তারা শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, মাত্র ৫০ জন উত্তরদাতার তথ্য নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যথেষ্ট কিনা তা প্রশ্নের দাবি রাখে। সাংবাদিকরাই বড় মানবাধিকার কর্মী। মানবাধিকারের কাজ করতে গিয়ে তাদের প্রাণও দিতে হচ্ছে। সর্বশেষ সাংবাদিক নাদিম হত্যাকাণ্ড তার বড় উদাহরণ।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারি কোনো সংস্থা নয়, এটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের আইনি সংস্থা মানবাধিকার কমিশনের কথা শোনে। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সব ভালো কাজের সংবাদ গণমাধ্যমে আসছে না। তিনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও বিদেশি নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বলেন, অপরাধী যেই হোক, অপরাধীই। তবে নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে ভূ-রাজনীতির সম্পর্ক আছে।

অ্যাডভোকেট জেড. আই. খান পান্না বলেন, গণতন্ত্র এখন নিলামে উঠেছে। ধনী ব্যবসায়ীরা টাকা দিয়ে তা কিনে নিচ্ছেন। এমপি-মন্ত্রী হচ্ছেন। দেশ এখন ব্যবসায়ী ও আমলাদের হাতে চলে গেছে। রাজনীতিবিদরা আর দেশ চালাচ্ছেন না।

নুরুল কবির বলেন, মানবাধিকার কমিশনের সব সুপারিশ সরকার গ্রহণ বা প্রয়োগ করতে বাধ্য নয়। তিনি আরও বলেন, একাধিক আইন নিয়েই বিতর্ক রয়েছে। সেখানে আইনের শাসন কীভাবে নিশ্চিত হবে?

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, মানবাধিকারকর্মীদের চাপ শুধু বর্তমান সময়েই নয়, ২০/২৫ বছর আগেও এই চাপ ছিল। মানবাধিকার কমিশন থাকার পরেও সেখানে গিয়ে প্রতিকার পাওয়া কঠিন হয়।

১. রাজনৈতিক প্রভাব ও পক্ষপাতদুষ্টতা:

অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন বা জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ (UNHRC) বড় শক্তিধর দেশগুলোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। ফলে তারা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত বা পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়।

উদাহরণ:ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের নিপীড়ন নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

২. প্রতিক্রিয়া আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়:

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ বা হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয় সংস্থাগুলো।

ফল:সহিংসতা বা গণহত্যা ঘটে যাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়, যখন আর কিছু করার থাকে না।

উদাহরণ: মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতন।

৩. বাস্তবিক ক্ষমতার ঘাটতি:

মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট বা সুপারিশ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। ফলে অনেক দেশ তা মানে না।

তাদের কাছে কমিশনের কোনো জোরালো প্রয়োগক্ষমতা নেই।

৪. নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক "নির্বাচনী" মনোভাব:

অনেক সময় কমিশন নির্দিষ্ট কিছু দেশকে টার্গেট করে, আর কিছু দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও চুপ থাকে যা *আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে*।

৫.আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ICC) সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব:

গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন ও আন্তর্জাতিক আদালতের মধ্যে তথ্য, নথি ও প্রমাণ ভাগাভাগি দুর্বল, ফলে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়।

৬. মুসলিম বিশ্বের বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা:
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে চীন, ভারত, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটলেও প্রতিবাদ খুব দুর্বল বা নেই বললেই চলে।

৭.ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাস্তব সহায়তার অভাব:
তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি হলেও ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা, আশ্রয়, পুনর্বাসনে কমিশনের কোনো বাস্তব ভূমিকা থাকে না।

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশন এখন অনেকাংশে নীতিহীন, নিষ্ক্রিয় ও রাজনৈতিক প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। শুধু রিপোর্ট তৈরি নয়, এখন কার্যকর ব্যবস্থা, চাপ প্রয়োগ ও আইনগত প্রয়োগক্ষমতা ছাড়া মানবাধিকার রক্ষা সম্ভব নয়।
সময় এসেছে এসব সংস্থাকে সংস্কার করে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা।

৮. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নির্ভরতা:
অনেক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা মাঠপর্যায়ে সরাসরি তদন্ত না করে সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্যের ওপর নির্ভর করে, যা অনেক সময় ভুল বা একপাক্ষিক হতে পারে। এতে রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

৯. বৈষম্যমূলক প্রভাব তদন্ত:
বিশ্বব্যাপী সংখ্যালঘু, নারী, শিশু ও শরণার্থীদের প্রতি সহিংসতা দীর্ঘদিন চললেও তা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কোনো মানবাধিকার পরিকল্পনা নেই, বরং ঘটনা ঘটার পর সাময়িক বিবৃতি দিয়েই দায় শেষ।

১০. অর্থনৈতিক স্বার্থের কাছে নৈতিকতা হারানো:
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বা কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট না করার জন্য, অনেক সময় মানবাধিকার কমিশন চোখ বন্ধ করে থাকে।
উদাহরণ: চীনের উইঘুর মুসলিম নির্যাতন, সৌদি আরবে মানবাধিকার লঙ্ঘন — এসব বিষয় নিয়ে UNHRC প্রভাবশালী অবস্থান নেয় না।

১১. ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের প্রতি অবহেলা:
বিশ্বের বহু দেশে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভূমি দখল, নিপীড়ন ঘটলেও এগুলো আন্তর্জাতিক কমিশনের নজরেই আসে না। তারা 'লো-প্রোফাইল ভিকটিম' হিসেবে অবজ্ঞার শিকার।

১২. ইসলামবিদ্বেষের ব্যাপারে নীরবতা:ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামফোবিয়া, হিজাব নিষিদ্ধকরণ, ধর্মীয় স্থানে আক্রমণ এগুলো স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায় নীরব। এটি দ্বিমুখী মানসিকতার প্রমাণ।

১৩. শরণার্থী সংকটে দুর্বল প্রতিক্রিয়া:
সিরিয়া, আফগানিস্তান, সুদান, প্যালেস্টাইন থেকে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ শরণার্থী নানাভাবে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, অথচ কমিশনগুলো নিরাপদ আশ্রয় ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় কোনো বাস্তব সহায়তা দিতে পারে না।

১৪.রাজনৈতিক আশ্রয় ও অভিবাসী অধিকার উপেক্ষিত:
বহু দেশ রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মানুষকে শারীরিক/মানসিকভাবে নির্যাতন করে, তারা আশ্রয় চাইলেও মানবাধিকার সংস্থাগুলো যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা দিতে পারে না।

মানবাধিকার কমিশনগুলো এখন শুধু কাগজে-কলমে কাজ করে, মাঠে বাস্তব প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ। তারা মৌলিক দায়িত্ব ও নিরপেক্ষতা হারিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ও দাতাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়, যা বৈশ্বিক মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গভীর সংকট তৈরি করছে।

এখন সময় এসেছে নতুন করে ভাবার বিশ্ব কি শুধু "প্রতিবাদ" চায়, নাকি সাহসী পদক্ষেপ ও সুশৃঙ্খল প্রতিরোধ?

ইসলাম ও মানবাধিকার

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী

কুয়েত ইউনিভার্সিটির তত্বাবধানে ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে অনুষ্ঠিত ছয় দিনব্যাপী ওয়ার্কশদের উদ্বোধনী প্রবন্ধে জনাব আইকে রুহি বলেন, মানবাধিকারই হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল ভিত্তি। প্রবন্ধে জনাব আইকে রুহি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের ভাষণকে মানবাধিকারের সর্বপ্রথম ঘোষণা হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইসলাম শুধু মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার কথাই ঘোষণা করেনি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপারেও অবহিত করেছে। তিনি মানবাধিকারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আলকুরআন হচ্ছে ফুরকান-সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। কুরআন মানুষকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে শেখায়। কুরআন মানুষকে কল্যাণ ও আলোর পথ দেখায়। মানুষের অধিকার আদায়ে সত্যের পক্ষে থেকে পাপাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। তিনি পশ্চিমা পি-তদের সমালোচনা করে বলেন, তারা মানবাধিকারকে বাড়ি ও রাষ্ট্রের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। এর বিপরীতে ইসলাম শুধু মানবাধিকারের রূপরেখাই পেশ করেনি, আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে তা মানার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে এবং সেসকস অধিকার পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেছে। (দৈনিক জঙ্গ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮০)

মানবাধিকারের রূপরেখা পেশ করা এবং তার ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে ইসলামের এমন কিছু বৈশিষ্টা আছে, পৃথিবীর কোনো আইন ও সংবিধান, কোনো ধর্ম ও মতবাদ, কোনো পি-ত ও বিজ্ঞজন যা অস্বীকার করতে পারবে না। ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম মানবাধিকারের সীমাকে এত প্রশস্ত করেছে যে, পুরো জীবন এর মাঝে এসে পড়ে। পিতা-মাতার হক, বন্ধু-বান্ধবের হক, শ্রমিক-মালিক এবং শাসক ও জনগণের হক, সরকারের হক, শ্রমজীবী মানুষদের হক, দুর্বল ও অসহায়দের হক, সাধারণ মুসলমানের হক, সাধারণ মানুষের হক ইত্যাদি।

শুধু মানুষেরই নয় ইসলাম চতুষ্পদ জন্তু ও অবলা প্রাণীর অধিকারও নিশ্চিত করেছে। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, বান্দার হক এবং আল্লাহ্র হক আদায় করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

ইসলামের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে অধিকার আদায়ের চেয়ে অধিকার প্রদানের বিষয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে। বর্তমান সমাজের বড় একটি দুর্বলতা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেকেই

নিজ নিজ অধিকারের তালিকা হাতে নিয়ে তা আদায়ের স্লোগান দেয়। কিন্তু অন্যদের যেসকল হক তার উপর রয়েছে তা আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গাফেল। যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার উসুলে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু অনোর অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে থাকবে গাফেল তখন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা হবে তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল, যা বর্তমান পৃথিবীতে একেবারেই স্পষ্ট। ইসলাম প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গুরুত্বের সাথে অন্যের হক ও অধিকার আদায়ের অনুভূতি জাগ্রত করে। কারণ, কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নারীদের কী কী অধিকার পুরুষের উপর আছে সে ব্যাপারে ইসলাম পুরুষদের সচেতন করে, কিরু নারীদেরকে অধিকার আদায়ের নামে রাস্তায় নামার উস্কানি দেয় না। স্ত্রীদেরকে স্বামীর হকের কথা মনে করিয়ে দেয়; স্বামীকে নিজ হক আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করতে বলে না। ইসলাম শ্রমিকের যাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দেয়ার জন্য মালিককে উৎসাহিত করে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ ছেড়ে রাস্তার ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে প্ররোচিত করে না। মোটকথা ইসলামে প্রতিটি মানুষকে তার উপর অন্যের যে হক রয়েছে তা আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক ঠিক ঠিক আদায় করছে কি না সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। এভাবে ইসলাম পুরো দেশ ও পুরো সমাজকে একশ ভাগ অধিকার প্রদানকারী হিসাবে দেখতে চায়। অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে শতভাগ সরব কিছু অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি নীরব- সমাজের এ দৃশ্য ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান সমাজে যে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা যাচ্ছে তা ইসলামের এ শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিমুখ হওয়ারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল।

ইসলামের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম শুধুই আইন ব্যবহার করে না; বরং মানুষের হৃদয়ে এমন বোধ ও চেতনা জাগ্রত করে, যা ব্যক্তির মাঝে দায়িত্ব পালনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে। ফলে শুধু আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং আল্লাহে সরুষ্টির আশা ও অসরুষ্টির ভয় এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহিতার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে নিজ থেকে সকলের হক ঠিক ঠিকভাবে আদায় করে দেয়। ইসলাম বলে, দুনিয়াতে কেউ যদি অন্যের কোনো ক্ষতি করে তাহলে কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু-পরমাণুর হিসাব নেয়া হবে; কড়ায় গ-ায় সকল হক শোধ করতে হবে। এমনকি কোনো

শিংওয়ালা বকরি যদি শিং ছাড়া বকরিকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন উভয়কে জীবিত করে শিংহীন বকরির বদলা দেয়া হবে। যখন বিবেকহীন প্রাণীদের মাঝে পর্যন্ত ইনসাফ করা হবে, প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে তাহলে যেসকল মানুষ সজ্ঞানে ও জাগ্রত বিবেকে অন্যের হক আত্মসাৎ করেছে তাদের সাথে কেমন আচরণ হবে?

মোটকথা ইসলাম তার পবিত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকারকে এ পরিমাণ সংরক্ষণ করেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ্র তুলনায় হক্কুল ইবাদকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, কারো মনে যেন অন্যের হক নষ্ট করার চিন্তাও না থাকে। ভুলবশত কারো হক নষ্ট হয়ে গেলে তা শোধরানো পর্যন্ত মনে শান্তি না আসে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম রা. মানুষের অধিকার আদায়ে ছিলেন শতভাগ সচেতন। তাই তাঁদের যুগে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার যে দৃশ্য পৃথিবী দেখেছে মানবেতিহাস এর নমুনা পেশ করতে অক্ষম। বর্তমান সময়ে নিজ দায়িত্ব পালনে ও অন্যের অধিকার প্রদানে মুসলমানদের মাঝে যে শিথিলতা দেখা যায় তা মূলত ইংরেজ-সভ্যতা ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের চিন্তানৈতিক দাসত্বের প্রভাব। এই অভিশপ্ত সভ্যতার প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে দ্বীনী ব্যাপারে শিথিলতা শুরু হওয়ার পর থেকে বিভেদ, ধর্মহীনতা ও অন্যের প্রাপ্য না দেয়াকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করা শুরু হয়েছে।

'ইসলাম ও মানবাধিকার' বিষয়টি শুধু প্রবন্ধ রচনার কিংবা কনফারেন্স আয়োজনের বিষয় নয়। বরং ইহুদী-খ্রিস্টানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের আদর্শ বানিয়ে দ্বীনকে নিজের জীবনে ধারণ করাই হচ্ছে সময়ের বড় প্রয়োজন।

অনুবাদে: শাহাদাত ছাকিব (সংগ্রহীত মাসিক আল কাউসার থেকে)

আগস্ট মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে কর্তৃপক্ষ জুলাই মাসের শেষ দিকে বিএনপির সমাবেশের আগের সপ্তাহগুলোতে ১,৫০০ এরও বেশি বিরোধী নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে নামসহ এবং আরো ১৫,০০০ অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। প্রত্যাশিত নির্বাচনের ৯০ দিনেরও কম সময়ের আগে এবং ঢাকায় বড় রাজনৈতিক সমাবেশের

আগে অক্টোবরে বিএনপি দাবি করেছিল যে কর্তৃপক্ষ ১৫ ঘন্টার মধ্যে তাদের দলের ২০০ নেতাকর্মীকে আটক করেছিল।

সরকার অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর জনসমাবেশমূলক অনুষ্ঠান আযোজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে এবং বিরোধী রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের সম্প্রচার সীমিত করেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ বিরোধী দলের অনুষ্ঠান ও সভা সমাবেশে যোগদান করতে যাওয়া ব্যক্তিদের টেলিযোগাযোগে বাধা দিয়েছে, এমনকি একই দিনে শাসক দলের আয়োজিত সমাবেশগুলো বাধামুক্ত ছিল।

নারী এবং প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ: কোনো আইন নারী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে সীমিত করেনি এবং তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফ্রিডম হাউজ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি এলজিবিটিকিউআই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত করেছিল। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোতে ধর্মীয়, জাতিগত এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির কম প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বহাল ছিল।

সরকারি দুর্নীতি

আইনে দুর্নীতির জন্য দোষী সাব্যস্ত কর্মকর্তাদের ফৌজদারি দণ্ডের বিধান থাকলেও সরকার এই আইন কার্যকরভাবে প্রযোগ করেনি। এই বছর সরকারি দুর্নীতির অসংখ্য প্রতিবেদন পাওয়া গেলেও সরকারি কর্মকর্তারা দায়মুক্তির কারণে প্রায়ই দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছে।

দুর্নীতির ঘটনা স্বাধীনভাবে মনিটর ও তদন্ত করতে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যাদের কাজ শুধু ঘুষ, আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি, মেধা/বিচক্ষণতার অপব্যবহার এবং অনুপযুক্ত রাজনৈতিক অনুদানে সীমিত না থেকে সামগ্রিকভাবে দুর্নীতির মামলাগুলো তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও আমলাদের বিরুদ্ধে আনা বেশিরভাগ মামলা থেকে তাদের খালাস পাওয়া এবং বিরোধী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া, তদন্ত ও মামলা দায়ের অব্যাহত থাকার বিষয়গুলো তুলে ধরে দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী আগস্ট পর্যন্ত দুদকে ৬,৫০০ এর বেশি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

দুর্নীতি: দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বহাল ছিল। ফ্রিডম হাউসের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে "দুর্নীতির বিস্তার সর্বব্যাপী এবং দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

জানুয়ারিতে দুদক ঢাকার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান তার ১৩ বছরের দায়িত্বপালনের মেয়াদকালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি ও বেশ কয়েকটি গাড়ি কিনেছেন এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ভদন্ত শুরু করে।

তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়েছে যে, তাকসিম তার বিলাসবহুল কেনাকাটার অর্থায়নের জন্য বিদেশী ঋণের অর্থায়নকৃত প্রকল্প থেকে অর্থ চুরি করেছেন।

ফেব্রুয়ারিতে গণমাধ্যমে গাজীপুরের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত একটি সরকারি আভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খবর প্রকাশিত হয়। তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল অর্থ প্রদান না করে আবর্জনা অপসারণের জন্য অর্থপ্রদান দেখানো, নির্মাণ না করে রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করা দেখানো, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কাছে ইজারা প্রদানের অর্থ আত্মসাত্ এবং অনুষ্ঠিত হয়নি এমন জনসমাবেশের জন্য অর্থ খরচ দেখানো। সরকারের এই আভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়নি।

দেশের দুর্নীতি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট স্টেটমেন্ট-এ নির্দিষ্ট দেশ সম্পর্কে দেখুন এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি রিপোর্ট দেখুন, যেখানে আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তদন্তের প্রতি সরকারি মনোভাব

কয়েকটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকারের ঘটনা তদন্ত করে ফলাফল প্রকাশ করেছে, তবে তাদেরকে উল্লেখযোগ্য সরকারি বিধিনিষেধের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। সরকারি কর্মকর্তারা বিরল ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা

করেছেন ও সাড়া দিয়েছেন বরং তারা কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ও অধিকারকর্মীদের নাম উল্লেখ করে মৌখিকভাবে আক্রমণ করেছেন।

যদিও মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিল, তবে তারা স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপও বজায় রেখেছিল। পর্যবেক্ষকরা অভিযোগ করেছেন যে সরকার কৌশলগতভাবে নাগরিক সমাজের কার্যকারিতা হ্রাস করেছে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে নাগরিক সমাজের এমন সদস্যরাও প্রকাশ্যে সরকারি নীতির সমালোচনা করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে গ্রেফতারের হুমকি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সরকার ২০২২ সালে মানবাধিকার সংস্থা অধিকার এর নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে সংগঠনটির তহবিল ও কার্যক্রমের উপর অব্যাহতভাবে বাধা দিয়ে আসছে। সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের উপর সরকারি কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা হয়রানি, ভয়ভীতি এবং নজরদারির কথা বলে আসছেন।

ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনাল অধিকারের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক নাসিরুদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগে মামলার শুনানি অব্যাহত রেখেছে। জুলাই মাসে, জাতিসংঘের তিনজন স্পেশাল র‍্যাপোটিয়ার অধিকারকে হয়রানি বন্ধ করতে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা এই মামলাকে মানবাধিকার রক্ষক এবং সংস্থাগুলোকে নীরব করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি ব্যবহারের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ট্রাইব্যুনাল খান এবং এলানকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রত্যেককে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ১০,০০০ টাকা জরিমানা করে। হাইকোর্টে তাদের আপিল ও তারই ধারাবাহিকতায় দেয়া রায়ের প্রেক্ষিতে ১৫ অক্টোবর কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জামিনে এক বছরের জন্য মুক্তি দেয় এবং জরিমানা স্থগিত করে।

সরকারের চাহিদা অনুযায়ী ধর্মীয় সংগঠনসহ সকল এনজিও-র সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন থাকতে হবে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো যারা মানবাধিকার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে তারা দাবী করেছে যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের উপর নজরদারি করে। সরকার কখনো কখনো প্রকল্প নিবন্ধন বিলম্ব করে, কার্যক্রম বন্ধ রাখার চিঠি দিয়ে এবং

ভিসা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার সামর্থ্যকে সীমিত করেছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বেশ কয়েকটি এনজিও-র প্রকল্প অনুমোদন এবং তহবিল ছাড়ে বাধা দিয়েছে। কয়েকটি এনজিও জানিয়েছে যে তারা সরকারের কাছ থেকে কার্যক্রম বন্ধ বা ধীর করার জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে জানতে পেরেছেন। আবার অন্যরা প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র জমা দেওয়া সত্বেও প্রকল্প অনুমোদন পেতে বারবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাসন ও অধিকার সংক্রান্ত সংবেদনশীল বিষয়ে কাজ করে এমন এনজিওগুলোর তহবিল ছাড়তে ব্যাংকগুলো অস্বীকার করেছে। দীর্ঘ বিলম্বের কারণে কিছু এনজিও তাদের কর্মীদের বেতন দিতে না পারায় তাদের কার্যক্রম কমিয়ে দিয়েছিল।

অধিকার নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে, আইনে দেশের সংবিধান, এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কিংবা সাংবিধানিক সংস্থাগুলো সম্পর্কে "অবমাননাকর" মন্তব্য করে এমন এনজিওগুলোর জন্য শাস্তিমূলক বিধান রাখা হয়েছে।

মানবাধিকার রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ: সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করেছে। মানবাধিকার রক্ষকর্মীরা দাবি করেছেন যে তারা ক্রমাগতভাবে সরকারি নজরদারির মধ্যে ছিলেন এবং তারা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ঘন ঘন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন।

জুলাই মাসে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ দেশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অবস্থা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় যে, জরিপে অংশ নেওয়া অন্তত ৬৫ শতাংশ মানবাধিকার রক্ষাকর্মী বলেছেন, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের কাজে বাধা দিয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হযেছে যে জরিপকৃতদের মধ্যে ৬২ শতাংশ তাদের কাজের সামগ্রিক পরিবেশকে "খুবই অনিরাপদ" বা "অনিরাপদ' হিসেবে দাবী করেছেন এবং ৪২ শতাংশ আইন প্রয়োগকারী, রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারি কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত উৎস থেকে হুমকি, ভয়ভীতি এবং নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন।

জাতিসংঘ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা: ২০১৩ সাল থেকে সরকার বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে জাতিসংঘের ডব্লিউজিইআইডি এর অনুরোধে সাড়া দেয়নি। বাংলাদেশে জাতিসংঘের

আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, ২০১৭ সাল থেকে জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোটিয়ারদের বাংলাদেশে আসার আরো কয়েকটি অনুরোধ মূলতবি রয়েছে, যার মধ্যে বিচারবহির্ভূত, সংক্ষিপ্ত বা নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ড বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার; শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া এবং সমিতি গঠনের অধিকার বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার; এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষার বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার-এর বাংলাদেশ সফরের অনুরোধ রয়েছে। জাতিসংঘের কয়েকজন বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার সফর করেছেন, যার মধ্যে মে মাসে সফরে করেন চরম দারিদ্র্য ও মানবাধিকার বিষয়ক র‍্যাপোর্টিয়ার এবং জানুয়ারিতে সফরে এসেছিলেন অভিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ক র‍্যাপোর্টিয়ার।

সরকারি মানবাধিকার সংস্থা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল কার্যক্রম হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত করা, আইনের বৈষম্য দূর করা, জনসাধারণকে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সরকারকে প্রধান প্রধান মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়া। বেশিরভাগ মানবাধিকার সংস্থা কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করেছিল যে সরকার তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করছে যার মধ্যে কমিশনও রয়েছে।

বৈষম্য এবং সামাজিক নির্যাতন

নারী

ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতা: আইনে পুরুষদের দ্বারা মেয়ে শিশু ও নারীদের ধর্ষণ এবং স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আইনে মেয়েশিশু বা নারীর বয়স ১৩ বছরের বেশি হলে বৈবাহিক ধর্ষণকে বাদ দেয়া হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সরকার এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো দেখেছে যে, ধর্ষণ বাংলাদেশে এখনো একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। ধর্ষকদের দিক থেকে ধর্ষণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাড়ার হুমকি দিয়ে ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীকে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ ছিল। এই সময়ে দায়মুক্তিসহ যৌন সহিংসতার অনেক ঘটনা ঘটেছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ একমাস আগে এক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছিল। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে, ধর্ষণের শিকার নারী যে রিকশা ভাড়া করেছিল সেই রিকশাচালক তাকে অপহরণ করে একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যায় যেখানে পাঁচজনের একটি দল তাকে ধর্ষণ করে। জুলাই মাসে পুলিশ ঢাকায় এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ধর্ষক ছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে একটি শপিং মলের তৃতীয় তলায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

ধর্ষণের ঘটনা ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসারে খানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনা সংঘটনের স্থান নির্বিশেষে ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য অবশ্যই নথিভুক্ত করবেন। ঘটনা নথিভুক্ত হওয়র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাসায়নিক এবং ডিএনএ

পরীক্ষা করতে হবে। নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে প্রতিটি খানায় ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার ভুক্তভোগীর মামলা ডিউটি অফিসার কর্তৃক রেকর্ড করার সময় সেখানে অবশ্যই একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা থাকতে হবে। ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীর জবানবন্দী অবশ্যই একজন আইনজীবী, সমাজকর্মী, সুরক্ষা কর্মকর্তা বা ভুক্তভোগী উপযুক্ত মনে করেন এমন অন্য যেকোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে নথিভুক্ত করতে হবে।

ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী হলে তার জবানবন্দী নেওয়ার প্রয়োজনে দোভাষীর দরকার হলে সরকারি সহায়তায় দোভাষী ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষা সঠিক সময়ে করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তাকে যেতে হবে।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, ধর্ষণের শিকার অনেক ভুক্তভোগী আইনি সেবায় প্রবেশাধিকার না পাওয়ায়, সামাজিক অপবাদ/কলঙ্কের ভয়, আরো হয়রানির ভয় এবং সাক্ষী হাজির করার আইনি প্রযোজনীয়তা থাকায় ধর্ষণের অভিযোগ করেননি। ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণের বোঝা ধর্ষিতার উপর ছিল, তাকে মেডিকেল প্রমাণ ব্যবহার করে ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করতে হয়েছে।

অন্যান্য ধরনের সামাজিক জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি: কয়েকটি এনজিও যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সহিংসতার কথা জানিয়েছে যদিও যৌতুকের দাবি বেআইনি। আইন অনুসারে যৌতুক দাবি করা বা দেয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু এই চর্চা দেশজুড়ে সাধারণ ঘটনা

হিসেবে লক্ষ্য করা গেছে। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে আসক নারীর বিরুদ্ধে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতার ১১৪টি ঘটনার কথা জানতে পেরেছে, যার মধ্যে ৫১ জন নারী যৌতুকের বিরোধের কারণে হত্যার শিকার হয়েছে। জুলাই মাসের শেষ দিকে খুলনায় ফুটবল খেলা অনুশীলনের সময় হাফপ্যান্ট পরার জন্য ছয় ব্যক্তি চার জন নারী ফুটবল খেলোয়াড়কে মারধর করে। ভুক্তভোগীদের একজন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলে অভিযুক্ত হামলাকারীরা নারী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, এসিড হামলা, তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি করা এবং হত্যার হুমকি দিতে থাকে। পুলিশ মূল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং ভুক্তভোগী ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়; যদিও হুমকির কারণে একাডেমির অর্ধেক নারী খেলোয়াড় অনুশীলনে যোগদান করা বন্ধ করে দেয়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানবাধিকার

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যেখানে মানবাধিকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে মানুষের জীবন, সম্মান, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছেন। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর, শিশুর, দাসের, সংখ্যালঘুর এবং যুদ্ধবন্দীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

কুরআনের আলোকে মানবাধিকার

১. জীবনের অধিকার

আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো প্রাণ হত্যা করে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল।" সূরা মায়িদাহ: ৩২

২. সম্মানের অধিকার

আল্লাহ বলেন: 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি'সূরা বনি ইসরাঈল: ৭০

৩. অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার

আল্লাহ বলেন: 'তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্য দাও ولو على أنضكم))তামার নিজের বিপক্ষে হলেও)। "সূরা নিসা: ১৩৫

৪. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা

আল্লাহ বলেন: "ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। "সূরা বাকারা: ২৫৬

হাদীসের আলোকে মানবাধিকার

১. পরস্পরের নিরাপত্তা

রাসূল (সা.) বলেছেন

"একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য নিরাপদ তার জান-মাল ও সম্মানের ব্যাপারে। 'বুখারি, মুসলিম

২. অন্যায় থেকে বিরত থাকা

"যে কারও ওপর জুলুম করো না, তোমাদের কেউ কারও সম্পদ নিজের করে নিও না। "(মুসলিম)

৩. নারীর অধিকার

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিযী)

৪. অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার

"সে মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইসলামের শিক্ষা হলো-সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা, কারও প্রতি অবিচার না করা এবং মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলা। বর্তমান বিশ্ব যদি কুরআন ও হাদীসের এই মূলনীতি মেনে চলত, তবে হয়তো মানবাধিকার লঙ্ঘনের এত ভয়াবহ চিত্র দেখতে হতো না।

মানবজাতির জীবন, ন্যায়বিচার ও অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন প্রায় সকল নবীই, কারণ আল্লাহ তাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং একে অপরের প্রতি ন্যায় ও দয়া প্রদর্শন করতে শেখানোর জন্য। তবে বিশেষভাবে যদি বলা যায় জীবনের অধিকার বা 'মানবজীবনের মূল্য ও মর্যাদা' নিয়ে যারা পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন

১. নবী আদম (আঃ)

মানবজাতির প্রথম নবী। তিনি মানুষকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্মান শেখান। তাঁর শিক্ষা থেকেই মানবজীবনের সূচনা হয়। যে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, তাই তার জীবনও পবিত্র।

২. নবী নূহ (আঃ)

তিনি মানুষকে অন্যায় ও সহিংসতা ত্যাগ করতে আহ্বান করেন। তাঁর সময়ে মানুষ পরস্পরের প্রতি অন্যায় করত, তিনি তাদের শান্তি ও আল্লাহভীতি শেখান যা জীবনের নিরাপত্তার মূলভিত্তি।

৩. নবী মূসা (আঃ)

তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্ত হন, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়:

তুমি হত্যা করো না নির্দোষ প্রাণকে।

এটি মানবজীবনের অধিকার রক্ষার অন্যতম প্রথম লিখিত নীতি।

৪. নবী ঈসা (আঃ)

তিনি দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসার বার্তা দেন। তাঁর শিক্ষা ছিল-

যে তলোয়ার তোলে, সে তলোয়ারেই নষ্ট হবে।

অর্থাৎ অন্যের জীবন নেওয়া নয়, বরং বাঁচানোই মানবতার কাজ।

৫. নবী মুহাম্মদ

মানবজীবনের অধিকার রক্ষায় তিনি সর্বাধিক সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি ঘোষণা করেন

একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মানে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করা, আর একজন মানুষকে রক্ষা করা মানে পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করা।

(সূরা মায়িদা ৫:৩২)

তিনি মানবাধিকার, নারী অধিকার, যুদ্ধবন্দিদের অধিকার, দাসমুক্তি, ন্যায়বিচার, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা সবকিছু নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেন।

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও নিস্ক্রিয়তা এ বিষয়ে কুরআন সরাসরি মানবাধিকার কমিশন নাম উল্লেখ করে কিছু না বললেও, 'যে জাতি বা গোষ্ঠী জুলুম করে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ রাখে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায় না আল্লাহ তাদের শাস্তির ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নিচে কুরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো:

১. জালিমদের বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা:

"আর জালিমদের প্রতি ঝুঁকেও থেকো না, তা হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে।"

সূরা হুদ, আয়াত ১১৩

যারা জালিমদের সহযোগিতা করে, চুপ থাকে, বা তাদের বিরুদ্ধে কিছু করে না তারা শাস্তির উপযুক্ত।

২. নিপীড়িতদের জন্য সাহায্যের ঘোষণা:

"নিশ্চয়ই আমি মজলুমের (নিপীড়িতের) দোয়া কবুল করি, যদিও সে কাফিরও হয়।"

হাদীস (মুসনাদে আহমদ)

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষের আর্তনাদ আল্লাহ অগ্রাহ্য করেন না।

৩. নিস্ক্রিয় ও নিরব থাকার পরিণতি:

"তোমরা কেন আল্লাহর পথে জিহাদ করো না তাদের মুক্তির জন্য যারা নির্যাতিত নারী, শিশু ও পুরুষ?" সূরা নিসা, আয়াত ৭৫

যারা মজলুমদের পাশে দাঁড়ায় না, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ প্রশ্ন তুলেছেন।

৪. শাস্তির দৃষ্টান্ত:

"তোমার পালনকর্তা ধ্বংস করে দিয়েছেন আদ, সামুদ, লুতের কওম যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল।" সূরা ফজর:৬-১৪

যারা অহংকার করে, অন্যায় করে এবং মানবতা ধ্বংস করে তাদের আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস করেন।

কুরআনের আলোকে বলা যায় মানবাধিকারের পক্ষে না দাঁড়ানো, জালিমের বিরুদ্ধে চুপ থাকা, এবং নিপীড়িতদের সাহায্য না করাও এক ধরনের অন্যায়। মানবাধিকার কমিশন যদি নিস্ক্রিয় থাকে, তবে তারা আল্লাহর কঠোর গজব থেকে নিরাপদ নয়।

"আল্লাহ জালিমদের কখনো ভালোবাসেন না।"

সূরা আলে ইমরান: ৫৭

জুলুম করা ও জুলুম সহ্য করাও সমান অপরাধ

হাদীস:

"যে ব্যক্তি কোনো জালিম শাসকের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশংসা করে, অথচ সে জানে সে জালিম তবে সে আল্লাহর ক্রোধের

শিকার হবে।"

(মুসনাদে আহমদ)

এই হাদীস মানবাধিকার রক্ষায় নিষ্ক্রিয় থাকার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করে।

ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো ফরজ:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।" সূরা নিসা, আয়াত ১৩৫

আল্লাহ এখানে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলমানদের বাধ্য করেছেন।

নির্যাতিতের হক রক্ষা করা জরুরি

"তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা নির্যাতন করে যতক্ষণ না নির্যাতনের অবসান ঘটে এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর হয়।" সূরা আনফাল, আয়াত ৩৯

মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা ইসলামের অন্যতম মূলনীত।

অন্যায় দেখেও মুখ না খুলার ভয়াবহতা:

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকুক যারা ন্যায়-নিষ্ঠার দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে। তারাই সফলকাম।"

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪

যারা অন্যায় দেখে চুপ থাকে, তারা ব্যর্থ জাতির অংশ।

নবী মূসা (আঃ)-এর সময়ের জালিম শাসক ছিলেন ফিরআউন (ফারাও)।

বিস্তারিতভাবে বলা যায়ঃ

ফিরআউন ছিল মিসরের রাজা, এবং সে নিজেকে "আমি-ই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু" বলে দাবি করত।

"আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন"

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

অর্থঃ "সে বলল, 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু।" (সূরা আন-নাজিআত ৭৯:২৪)

ফিরআউনের জুলুম:
সে ইসরাইলি জাতিকে দাস বানিয়েছিল।

ছেলে সন্তানদের হত্যা করত, আর মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত দাসী হিসেবে।

আল্লাহর রাসূল মুসা (আঃ)-এর প্রতি অবাধ্যতা করে নিজেকে দেবতা বলে দাবি করে।

ইসলাম ও মানবাধিকার (Islam and Human Rights)

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মানুষের সম্মান, অধিকার ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছেন

"আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানদের মর্যাদা দিয়েছি" (সূরা ইসরা: ৭০)

ইসলামে মানবাধিকারসমূহ:

জীবনের অধিকার:

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম।

"একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার মতো। "(সূরা মায়েদা: ৩২)

ইজ্জত ও মর্যাদার অধিকার:

পরনিন্দা, অপবাদ, গীবত ও অপমান ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

ধর্ম পালনের স্বাধীনতা:

"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা বাকারা: ২৫৬)

সম্পত্তির অধিকার:

চুরি, জুলুম, ঘুষ, সুদ-সব haram ঘোষণা করা হয়েছে।

নারী ও শিশুদের অধিকার:

ইসলাম নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকার দিয়েছে।

শিশুরাও ভালোবাসা ও দায়িত্বের অধিকার রাখে।

বিচার ও ন্যায়বিচারের অধিকার:

ইসলাম সব মানুষের জন্য সমান বিচার নিশ্চিত করে, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে।

ইসলাম মানবাধিকারের পূর্ণ সংরক্ষক।

যেখানে আজকের দুনিয়ার মানবাধিকার সংস্থাগুলো রাজনৈতিক ও জাতিগত কারণে ব্যর্থ, সেখানে ইসলাম সর্বজনীন

ন্যায়বিচার ও সম্মানের বার্তা দিয়েছে।

*ইসলামই প্রকৃত মানবাধিকারের পথপ্রদর্শক।

মানবাধিকার- বাধের ইসলামি ভিত্তি

Human Rights in Islam (লেখক Sayyid Abul Ala Maududi)-র মতে, ইসলাম মানবাধিকারকে সামাজিক অনুগত জীবনের অংশ হিসেবে নিয়ে এসেছে-এগুলি মানুষের "অর্জণযোগ্য অধিকার" নয়, বরং জন্মসিদ্ধ দায় ও মর্যাদা।

এমনই একটি গবেষণায় বলা হয়েছে Islam and the Discourse on Universal Human Rights"-তে ইসলামি শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মূল্যবোধের মধ্যকার মিল ও ভেদ তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামি দৃষ্টিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ

মানুষের মর্যাদা: "আমি আদম সন্তানদের মর্যাদা দিয়েছি" (সূরা ইসরা: ৭০) ইসলামে মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের অনিবার্যতা নির্দেশ করে।

জীবন ও নিরাপত্তার অধিকার: আয়াত 'যে কোনো প্রাণ হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য" (সূরা মায়িদা: ৩২) এই অধিকারকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরে।

ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব: "তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্য দাও" (সূরা নিসা: ১৩৫) মুসলিমদের সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষার দায়িত্ববোধ দেয়।

বর্তমানে মানবাধিকার শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার দীন নিয়ে গর্ববোধ করা এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যে, মানুষকে আল্লাহ পক্ষ থেকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা অনেক বড় নিয়ামত। কারণ, কিসে মানুষের কল্যাণ রয়েছে সে ব্যাপারে এবং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন: *সূরা আল-মুলক আয়াত ১৪:*

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সব খবর রাখেন।"

(সূরা মুলক: আয়াত-১৪)

মহান আল্লাহ শরীয়তের মধ্যেই 'মানবাধিকার 'সুরক্ষা করেছেন। তিনি সর্বশ্রেণির মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন।

অনেকেই মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন, ইসলামি শরিয়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন-চরিত, কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলি, চার খলিফা ও তৎপরবর্তী খলিফাদের কর্মপদ্ধতি হল, মানবাধিকারের পূর্বতন সনদ। ইসলামের এই মানবাধিকারগুলো একদিক দিয়ে অভূতপূর্ব এবং অতি উঁচুমানের আবার অন্যদিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও উন্নত মানসম্পন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। গবেষকগন এ বিষয়ে পর্যাপ্ত লেখালেখি করেছেন।

গবেষকদের দৃষ্টিতে জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত মানবাধিকার:

গবেষকদের মধ্যে অনেকেই জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারকে দূর্বল দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলতে চেয়েছে, মানবাধিকার সনদের প্রতিটি বিষয় ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী শরিয়তে আগে থেকেই ঘোষিত হয়ে আছে। এমনকি দাস
প্রথার বিলুপ্ত এবং নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি ও।

তারা এ দুটি বিষয়ের পূর্ব নজির এবং প্রচলন বের করার চেষ্টা করেছেন।

তাদের মধ্যে অনেকেই বিষয়টিকে প্রবন্ধ আকারে জ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, পশ্চাত্যে যে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা হয় বা জাতিসঙ্ঘ যেটা ঘোষণা করেছে সেটার মধ্যে কিছু বিষয় আছে শরিয়ত সম্মত আর কিছু আছে মূলত: শরিয়তের সাথে এমন কি সুস্থ বিবেক- বিবেচনার সাথেও সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন সকল বিধিবিধান তার নিকট থেকেই গ্রহন করি। আল্লাহ বলেছেন,

وأن أحكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না তাদের থেকে সর্তক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।

(সূরা মায়িদাহ: আয়াত-৪৯)

মজলুমের পাশে না দাঁড়ানো

অনেক বড় জুলুম

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

গায্যার বিষয়টা পুরোনো হচ্ছে ঠিক। কোনো কিছু পুরোনো হলে মানুষ ধীরে ধীরে সেটি ভুলে যায়া আমরা তো ভুলে বসে আছি, কিন্তু ইসরাইল কি জুলুম করা তুলেছে, নাকি জুলুমের মাত্রা আরও বাড়াচ্ছে?

বিভিন্ন অমুসলিম দেশে অমুসলিমরা পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছো তাহলে আমাদের দিলে কি একটু ঈমানী চেতনা নেই? কাজেই সব সময় তাদেরকে দুআতে স্মরণ রাখতে হবে।

আরেক হল যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, সেখানে সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা করা। আপনি যদি চারদিকে তাকান, সেখানে সাহায্য পাঠানোর নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্র খুঁজে পাবেন! আপনি তালাশ করলে এবং খুঁজলে নির্ভরযোগ্য সূত্র অবশ্যই পাবেনা প্রত্যেকে যার যতটুকু সাধ্য আছে, নিজ দায়িত্বে সেখানে সাহায্য পাঠানোর জন্য খুব গুরুত্বের সাথে বিষয়টাকে নেওয়ার চেষ্টা করি! এতে আল্লাহর কাছে যদি কোনোরকমে বাঁচা যায় যে, আল্লাহ আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী কিছুটা হলেও চেষ্টা করেছি। নতুবা এই আন্তর্জাতিক পাপ ও আন্তর্জাতিক জুলুমের দায় সবাইকে নিতে হবো ইসরাইল জুলুম করে যাচ্ছে আর আমরা বসে বসে তামাশা দেখছি, যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি না। মজলুমদের পাশে দাঁড়াচ্ছি না।

এই যে মজলুমের পাশে আমি দাঁড়াচ্ছি না, এটাও অনেক বড় জুলুম। মজলুমকে জালেমের হাতে ছেড়ে দেওয়া, জালেমের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা না করা, এটা কবীরা গুনাহ এবং বড় জুলুম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

المسلم أخو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُه وَلَا يُسْلِمُه.

মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালেমের হাতে ছেড়ে দেবে না, সোপর্দ করবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৪২

আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সবাই এই জুলুমের মধ্যে লিপ্ত আছি- বিষয়টা নিয়ে একটু ভেবে দেখা উচিতা বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের যত দেশের দূতাবাস রযেছে, বাংলাদেশের তাওহীদী জনতার পক্ষ থেকে সকল দূতাবাসের দায়িত্বশীলদেরকে আমরা

জানাতে চাচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের দেশের সরকারকে আমাদের এই বার্তা পৌঁছাও, যেন এই জুলুম বন্ধ করার জন্য সবাই ইসরাইলের ওপর যথাযথ চাপ প্রয়োগ করো

আমাদের এখানে মিশরের দূতাবাস আছে। মিশরের দূতাবাসের কাছে আমরা এই বার্তা পাঠালাম, তুমি তোমার সরকারের কাছে আমাদের এই জোর দাবি পৌঁছাও যে, তোমরা বর্ডার খুলে দাও, যাতে গায্যায় সাহায্য যথাযথভাবে পৌঁছাতে পারো গায্যার দিকে তোমাদের যে বর্ডার সেটা যদি বন্ধ থাকে, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতও বন্ধ হয়ে যাবো মুসলিম দেশগুলোর রাস্তা তোমাদের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারো সবাই সবকিছু অনেক দিন বরদাশত করে না। মজলুমদের ওপর জুলুম হতে থাকবে আর সবাই তামাশার মতো করে দেখতে থাকবে, এটা হয় না! কেউ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না, সবাই নিজেকে মাযূর মনে করে! আল্লাহ জানেন, কে বাস্তবে মাযূর আর কে মানূর নয়া

আমলেই কি সবাই মায়ূর ও অক্ষম?!

অনেক শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজেদের কেন মাত্র (অঙ্কম) মনে হয়? বাস্তবেই কি সবাই অক্ষম?

বর্তমান বিশ্বের অবস্থা এমন যে, সবাই নিজেকে অক্ষম মনে করে। গাজায় গণহত্যা চলছে, জাতিগত নিধন চলছে, নিজেরাই যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে, কিন্তু সেই চুক্তি ভঙ্গ করে নিজেরাই নতুন করে হামলা শুরু করে। হাজার হাজার নারী-শিশু শহীদ হচ্ছে আর গোটা বিশ্ব নীরব ভূমিকা পালন করছে। আবার তারাই মানবাধিকারের স্লোগান দেয়া

বিষয়টা কিন্তু সবাই দেখছে। আমি দেখছি, আমি বলি, আমি কী করতে পারি? আপনি দেখছেন, আপনি বলছেন, আমার কী করার আছে? আমাদের দেশের সরকার দেখছে, সরকার বলে, আমরা কী করতে পারি? পাকিস্তান সরকার দেখছে, তারা বলে, আমরা কী করতে পারি? আরব দেশগুলো দেখছে, তারা বলে, আমরা কী করতে পারি? যেন সবাই মাযূর ও অপারগা কারোরই কিছু করার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আসলেই কি সবাই মায়ূর ও অক্ষম?!

বাস্তবে অক্ষম হওয়া আর নিজেকে অক্ষম মনে করা এক নয়।

এ তো গুনাহের শাস্তি

আরেকটা বিষয় হল, অনেক ওযর ও অপারগতা মূলত নিজেদের গুনাহের শাস্তি। ওই গুনাহ থেকে বের হয়ে এলেই কাজ হয়ে যায়। ওসব অপরাধ ছেড়ে তওবা করলেই ঈমানী শক্তি জাগ্রত হযে যারা তখন দেখা যাবে, আপনার ঈমানী শক্তি কত বেশি! তখন নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সামনে আসবে; যা কাজে লাগাতে পারলে সমস্ত জালেম শক্তি পরাস্ত হতে বাধ্যা

আমার কাছে যদি আমার আখেরাতের ফিকিরই না থাকে, আল্লাহর বান্দার কোনো কদরই যদি আমার অন্তরে না থাকে, তখন হাজারো শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অক্ষম ও মানূরই মনে হবো

এখন সৌদি আরবও মাযূরা মিশরও মাযূরা জর্ডানও মাযূরা মধ্যপ্রাচ্যের সবাই মাযূর। কেউ পারছে না পাশে দাঁড়াতে। অথচ কেউই মূলত মানূর নয়; বরং প্রত্যেকের কাছেই আছে শক্তি-সামর্থ্য, নেই কেবল ঈমানী শক্তি। নেই আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভালবাসা! নেই মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি দরদ ও ব্যথা!

মুসলিম দেশগুলো যদি আজও নিজেদের ঈমানী শক্তিকে জাগ্রত করে, এক আমেরিকা কেন, আরও দশ আমেরিকাও যদি ইসরাইলের পেছনে থাকে, মুসলিম উম্মাহ্র সঙ্গে তাদের পারার কোনো সম্ভাবনা নেই ইনশাআল্লাহা

এই যে আমেরিকাকে খোদা মনে করা- এটা শিরক কি না? কেমন যেন আল্লাহ না চাইলেও আমেরিকা আমাদের এই এই ক্ষতি করে ফেলতে পারবে! এমন আকীদা শিরক কি না? তুমি যে আমেরিকা আর ইসরায়েলকে খোদার মতো মনে করছ, এটাও তো শিরক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, প্রভোকে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য পৌঁছানোর চেষ্টা করুনা ইচ্ছা থাকলে সূত্র আপনিই খুঁজে পাবেন। তালাশ করলে এবং চেষ্টা করলেই নির্ভরযোগ্য সূত্র আপনি আপনার চারপাশে পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন- আমীনা

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[বায়তুল মোকাররমের জুমার বয়ান থেকে)

তিনি আরও বলেছেন,

ان الحكم إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْلِمُوا إلا إياه

" আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করো না।"

(সূরা ইউসূফ : আয়াত-৪০)

যেভাবে জ্ঞান ও তত্ত্বগত (Theoretical) বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে সেভাবে বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও আল্লাহর

বিধান অনুসরণ করতে হবে।

পশ্চাত্যের মানবাধিকারের মধ্যে মুসলিমদের কোন কল্যাণ নেই:

পশ্চাত্য এবং তাদের অনুসারীরা সম্রাজ্যবাদী এবং ইসলামের দুশমনদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যে মানবাধিকার দেওয়ার আহবান জানাচ্ছে তা অনুসরণে ইসলাম ও মুসলিমদের কোন ফায়দা নেই। বরং তা মুসলমানদের বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করার পথ খুলে দিবে। শুধু তাই নয় বরং এটি মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন ও আর্দশ থেকে বিচ্যুত করে পশ্চাত্যের অনুসরণীয় তথাকথিত স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা, নারী- পুরুষের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, রাজনৈতিক ব্যাপারাদী ইত্যাদির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

সব অধিকারের মূল হল, মানবাধিকার:

মানবাধিকারের উৎস হল আল্লাহর এই বাণীটি:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"নিশ্চয় আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"

(সূরা আল-ইসরা: আয়াত-৭০)

আলিমগণ বলেন, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দু ভাবে মর্যাদা প্রদান করেছেন।

এক.তিনি সৃষ্টি ও গঠনগতভাবে মানুষকে সম্মানিত করার পাশাপাশি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তার আওতাধীন

করে দিয়েছেন।

দুই. মানুষ কে অন্য সকল প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

জীবন ধারণ, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক, আরাম-আয়েশ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব কিছুতেই তিনি মানুষকে অন্য সকল প্রাণীর উপর

প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর অন্যান্য প্রাণীকূলের উপর মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত শরিয়তের

বিধান এসেছে।

পুরোনো যুগে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার রক্ষা, কর্তৃত্ব ও কমিশনের ব্যর্থতার বিশ্লেষণ

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা আধুনিক বিশ্বের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। রাষ্ট্রগুলো সাধারণত মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ কমিশন রাজনৈতিক চাপ, ক্ষমতার প্রভাব, দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পুরোনো যুগে ইসলাম মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যে কঠোর, স্পষ্ট ও কার্যকর নীতিমালা প্রদান করেছে, তা আজকের মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতাকে মূল্যায়নের শক্তিশালী মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ইসলামে মানবাধিকার রক্ষার মৌলিক ভিত্তি

ইসলাম মানবাধিকারকে শুধু আইনি বিধান হিসেবে নয়, বরং ঈমান, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে দেখেছে। কুরআন ও হাদিসে বারবার দুর্বলদের অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং ক্ষমতার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান রয়েছে। এসব নীতির আলোকে বলা যায়
ইসলামে মানবাধিকার রক্ষা একটি ধর্মীয় ফরজ দায়িত্ব।

ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিষয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা

আমানতের ধারণা

ইসলাম বলে
ক্ষমতা, দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব একটি বড় “অমানত” ।
মানবাধিকার কমিশনও একইভাবে একটি আমানতধারী প্রতিষ্ঠান।

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা = খেয়ানত

কুরআনে (সুরা নিসা ৫৮) বলা হয়েছে যে, ক্ষমতাধারীদের ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমিশন যদি রাজনৈতিক চাপ, ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর প্রভাব বা উদাসীনতার কারণে কাজ না করে
ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অমানতের খেয়ানত, যা গুরুতর পাপ।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরবতার ইসলামী অবস্থান

ইসলামের অন্যতম স্পষ্ট নির্দেশ
জুলুম দেখলে প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

নীরবতা = জুলুমের অংশীদার

হাদিসে বলা হয়েছে:
"যে ব্যক্তি অন্যায় দেখে প্রতিহত করে না, সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

আজকের মানবাধিকার কমিশন যখন নিস্ক্রিয়, নীরব বা উদাসীন হয়ে পড়ে–
ইসলামী আইনে তারা অন্যায়ের অংশীদার হিসেবেই বিবেচিত হবে।

দুর্বলদের অধিকার রক্ষায় ইসলামের অবস্থান

ইসলামে দুর্বল, গরিব, অসহায়, নিপীড়িত, নারী, শিশু, যুদ্ধাহত, অভিবাসী,

এদের অধিকার রক্ষা করা ঈমানের অংশ। নবী (সা.) বলেছেন:
"দুর্বলদের অধিকার রক্ষা করো, কারণ তাদের অধিকার আদায় করাই উম্মাহর শক্তি।"

সুতরাং কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা মানে দুর্বলদের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

রাজনৈতিক চাপ বা ভয় পেয়ে দায়িত্ব না পালনে ইসলামের সিদ্ধান্ত

সত্য কথা বলা সর্বোচ্চ ন্যায় প্রতিষ্ঠা

হাদিস:
"জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হলো সর্বোচ্চ জিহাদ।"

আজকের সময়ে মানবাধিকার কমিশন যদি রাজনৈতিক প্রভাব বা বিভিন্ন চাপের কারণে অন্যায় প্রকাশ না করে
ইসলাম এটিকে কাপুরুষতা এবং দায়িত্বহীনতা বলে।

বিচারহীনতা ও বিলম্ব সম্পর্কে ইসলামের নীতি

ইসলাম দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে জোর দিয়েছে।
বিচার বিলম্ব = বিচার অস্বীকার।
নবী (সা.) বিচারপ্রার্থীকে অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রতা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট বিলম্বিত করা, মামলা ঝুলিয়ে রাখা বা তদন্ত না করা ইসলামের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ইসলামে ক্ষমতার জবাবদিহিতা ও মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার তুলনা

খলিফা উমর (রাঃ) বলেছিলেন:
"নদীর পাড়ে কুকুরও যদি ক্ষুধায় মরে, তার জন্য আমিই দায়ী।"

এই বক্তব্য ইসলামে জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করে।
মানবাধিকার কমিশন আজ যদি নাগরিকের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়–
ইসলামের নীতি অনুযায়ী তারা কঠোর দায় বহন করবে।

সমাজের দায়িত্ব: শুধুই কমিশনের নয়

ইসলাম শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানকে দোষ দেয় না; বরং বলে–
উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব অন্যায় প্রতিরোধ করা।

সুতরাং, মানবাধিকার কমিশন ব্যর্থ হলেও–
সমাজ, আলেম, বিচারব্যবস্থা, মিডিয়া ও নেতৃত্বেরও দায় রয়েছে।

ইসলামের আলোকে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার মূল্যায়ন

নিচের দৃষ্টিকোণ থেকে কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা

অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরবতা

দুর্বলদের অধিকার অস্বীকার

ক্ষমতার অপব্যবহার

জবাবদিহিতা অনুপস্থিত

ভয় বা চাপের কাছে আত্মসমর্পণ

বিচার বিলম্ব বা বিচারহীনতা

ইসলামের মতে এগুলো গুরুতর অপরাধ, এবং সমাজকে দুর্বল করে।

পুরোনো যুগের ইসলামী নীতিমালা মানবাধিকার রক্ষায় অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর নির্দেশনা দিয়েছে। আজকের মানবাধিকার কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা, দুর্নীতি, ভীতি বা রাজনৈতিক প্রভাব ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক, আইনি ও ধর্মীয় ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হবে। ইসলাম এমন একটি শক্তিশালী ন্যায়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকা নিজেই অপরাধ। অতএব, ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক সমস্যা নয়–এটি নৈতিক অবক্ষয় এবং ঈমানের দুর্বলতার প্রতিফলন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কূটনীতি ও বাংলাদেশের ভূমিকা

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানবাধিকার কূটনীতি বিশ্ব সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি, ঘোষণা ও কনভেনশনগুলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। ২০০৬ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (UNHRC) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষার কাঠামোগত প্রয়াসের সূচনা ঘটে। এই কাউন্সিল মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা রক্ষা এবং নির্যাতন ও লঙ্ঘন রোধে পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ শুরু থেকেই এই কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছে। মানবাধিকারকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ৪৭সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলে বাংলাদেশ ১৬০ ভোট পেয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। টানা দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ ছয় বছর ধরে এই কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকা নিশ্চিত করেছে যা দেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বৃদ্ধি করেছে।

তবে মানবাধিকার কূটনীতি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। পশ্চিমা শক্তি ও রাষ্ট্র স্বার্থের প্রভাবে মানবাধিকার ইস্যু প্রায়শই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মানবাধিকার নীতি প্রণয়নে জটিলতা তৈরি হয়। এছাড়া বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলে কোনো না কোনো সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটছে ফলে বিশেষ কিছু রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে পদক্ষেপ নেওয়া সবসময়ই সমস্যার সৃষ্টি করে।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, জাতিসংঘের মানবাধিকার কূটনীতি বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কার্যকর হচ্ছে। বাংলাদেশের বিপুল ভোট ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে দেশের মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সক্ষমতা রয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের লক্ষ্য থাকবে কাউন্সিলে অগ্রণী ভূমিকা রেখে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত করা এবং বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় (OHCHR) ও দেশে আপত্তি

জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় (OHCHR) বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষায় রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এটি ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘ সচিবালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে পরিচালিত হয়। সংস্থার ম্যান্ডেট উদ্‌ভূত ইউএন চাটার এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র থেকে। OHCHR-এর মূল লক্ষ্য হলো সবার জন্য মানবাধিকার বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করা।

কার্যালয়ের কার্যক্রম অত্যন্ত বিস্তৃত। এটি সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করতে, মানবাধিকার ইস্যুতে নেতৃত্ব দিতে, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রচেষ্টা সমন্বয় করতে কাজ করে। এছাড়া, নতুন মানবাধিকার মানদণ্ড তৈরি, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান (NHRIs) সমর্থন, গুরুতর লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও সংস্থার দায়িত্ব। OHCHR-এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়, এবং নিউইয়র্ক, আঞ্চলিক ও দেশীয় কার্যালয়সহ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত উপস্থিতি বজায় রাখে।

বাংলাদেশে ঢাকায় কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে তিন বছরের একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে কিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই সিদ্ধান্তের তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। তাদের প্রধান উদ্বেগ হলো, অতীতে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবাধিকারের নামে ইসলামি শরিয়াহ পারিবারিক আইন ও ধর্মীয় মূল্যবোধে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে এলজিবিটি অধিকারের মতো বিষয়গুলো এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। সমালোচকেরা মনে করেন, কার্যালয় দেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করতে পারে এবং সরকারের কাজে হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকার এই উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, OHCHR মিশন কোনো হস্তক্ষেপমূলক সংস্থা হবে না। এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে। এটি কোনো সামাজিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের প্ল্যাটফর্ম হবে না এবং দেশের আইন, সামাজিক রীতি ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর বাইরে যাবে না। সরকারের পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার থাকবে চুক্তি থেকে সরে আসার, যদি

অংশীদারিত্ব দেশের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না মনে হয়। সরকারের মতে, এই ধরনের একটি কার্যালয় পূর্ববর্তী সময়ে যদি থাকত, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গণহত্যার মতো অপরাধের তদন্ত, নথিভুক্তি ও বিচার কার্যকরভাবে করা সম্ভব হতো।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়: প্রয়োজনীয়তা ও বিতর্ক

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে একটি কার্যালয় স্থাপনের পাঁয়তারা করছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এত তীব্র যে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও স্থায়ী কার্যালয় অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে কি? বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও সংহত। অন্যদিকে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন বেশি বা দীর্ঘমেয়াদি, যেমন ভারত বা মিয়ানমার, সেখানে স্থায়ী মানবাধিকার কার্যালয় নেই। এই তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ কমপ্রকাশিত মনে হচ্ছে।

প্রথমবার কার্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবনা আসে, তখন তা নিয়ে কিছু প্রতিবাদও হয়। তবে সম্প্রতি বিষয়টি পুনরায় সামনে এসেছে। এই প্রস্তাবনার কারণে দেশীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে ইসলামী মূল্যবোধ, পারিবারিক আইন এবং ধর্মীয় আদর্শের প্রতি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই কারণে কিছু সংগঠন জাতিসংঘের এই পদক্ষেপকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে।

জাতিসংঘ ও তার মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমের উপরও সমালোচনা রয়েছে। কমিশন অতীতেও বহু সংকটপূর্ণ অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, রোহিঙ্গা সংকট, সিরিয়া, ইরাক ও লিবিয়ার মতো অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারিনি। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ এবং সংঘাতের স্থায়িত্বও কমিশনের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে। এই ব্যর্থতা দেশীয় পর্যায়ে তাদের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন আড়াল না করলে দপ্তরে আপত্তি কেন?

বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের স্থায়ী দপ্তর খোলার প্রস্তাব নিয়ে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অতীতে স্বৈরশাসনের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন যেমন-গুম, বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড, ভোটাধিকার হরণ-প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কমিশন কার্যকরভাবে স্থায়ী নজরদারি রাখতে পারেনি। এখন, যখন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, অনেকেই প্রশ্ন করেন, স্থায়ী দপ্তর কি সত্যিই প্রয়োজন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক সংগঠন কার্যালয় স্থাপনের পেছনে ষড়যন্ত্র বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখছেন। তাদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং নারী অধিকার নিয়ে বিদেশি সংস্থার নজরদারি দেশের সার্বভৌমত্ব ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তবে এই উদ্বেগের মূল কারণ হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনকে আড়াল করার প্রবণতা। যেখানে লঙ্ঘন ঘটছে এবং তা প্রকাশ পায় না, সেখানে কোন সংস্থা হস্তক্ষেপ করুক-এই মনোভাবই আপত্তির মূল।

এমন অবস্থায়, যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, যদি সরকারের পক্ষ থেকে দেশে মানবাধিকার রক্ষার রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকে এবং আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী কার্যকরভাবে কাজ করে, তাহলে আন্তর্জাতিক সংস্থার উপস্থিতি কোনো হস্তক্ষেপ নয় বরং সহযোগিতা হিসেবে দেখা উচিত। উদাহরণ হিসেবে গত বছর, ছাত্র হত্যার ঘটনার পর জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা তদন্ত করে জরুরি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল, যা ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃশ্যমান করেছে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার একটি মৌলিক ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলেও, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, বিশেষ করে জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিশন, নিরীহ মানুষের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ও নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে পারছে না। গণহত্যা, জাতিগত নিধন, যুদ্ধাপরাধ ও নিপীড়নের ঘটনা যেমন-রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ, ফিলিস্তিনে গণহত্যা, সিরিয়া ও ইয়েমেনে সংঘটিত অমানবিক কর্মকাণ্ড-প্রমাণ করে যে, এসব সংস্থা রাজনৈতিক প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব এবং কার্যকর আইনি ও বাস্তবায়ন ক্ষমতার অভাবে ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয়।

এই ব্যর্থতার মূল কারণ হলো: রাজনৈতিক চাপ ও স্বার্থের প্রভাব, কার্যকর বলবৎ করার ক্ষমতার অভাব, এবং স্পর্শকাতর বিষয়ে নীরব থাকা। এর ফলে নির্যাতিতরা সুবিচার পায় না এবং বিশ্ববাসীর বিশ্বাস হারায়। যদি এই নীরবতা অব্যাহত থাকে, মানবাধিকার রক্ষার লড়াই আরও দুর্বল হবে।

অতএব, মানবাধিকার রক্ষা কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকা নয়; প্রয়োজন কার্যকর, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কাঠামো, যা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করবে। মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে স্বাধীন মানবাধিকার কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। ইসলামিক নীতি, নৈতিকতা, ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মানবাধিকার চর্চা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রকৃত মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রস্তাবনা:

- মুসলিম দেশগুলোকে স্বাধীন, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত মানবাধিকার কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- ইসলামি স্কলার, গবেষক ও নীতিনির্ধারকরা একযোগে কাজ করবে।
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনকে প্রটোকল নির্ভর নয়, বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- মানবাধিকার রক্ষা শুধু আইনি কাঠামো নয়, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিফলিত হতে হবে।